প্র চ্ছ দ
কা হি নী

- রয়েল বেঙ্গল টাইগার
- ব্ল্যাক প্যান্থার
- কোবরা
- পাইথন
- পুলিশ

কাকে প্রয়োজন

ভাড়াটে সন্ত্রাসী

রিপোর্ট : **গোলাম মোর্তোজা**

‘যতই ট্রিগার টিপি, গুলি আর বাড়ায় না। এদিকে টার্গেট তো চিনে ফেলছে। বন্দুকওয়ালা গার্ড আবার তার সাথে। আমরা মানুষ পাঁচজন। যন্ত্র (অস্ত্র) চারডে। একজনের কাছের দু’ডে জর্দার কটে (ককটেল)। আমাগরে আতে (হাতে) যন্ত্র দেখে, গার্ড বন্দুক নিয়ে কাঁপতেছে। কাঁপতেছি আমরাও, কারণ গুলি বাড়াতেছে না। একজনের গুলি বাড়ায়া যায়া ল্যাগলো গার্ডের বুকে। চিৎকার দে পড়ে গেল সে। বন্দুকের দিকে হাত বাড়ালো টার্গেট। ককটেল মারল একজন। আমার গুলিও বার ওলো। গিয়ে লাগলো এক্কেবারে টার্গেটের মাথায়। তারপর আর এ্যটা গুলি করলাম বুহি (বুকে)। যার হাতে ককটেল ছিল সে টার্গেটের বন্দুক তুলে নিয়ে ফাঁকা গুলি ক্যরলো। আর যার গুলি গার্ডের গায় ল্যাগছে, সে মরা টার্গেটের গায় যন্ত্র ঠ্যাকায়া গুলি ক্যরলো। গুলি আর বোমার শব্দে আশপাশের সব মানুষ ভয়ে আগেই ছুটে পলাইছে।

এই অপারেশন সময় ল্যাগে গেল সাত-আট মিনিট। কিন্তু সময় লাগার কথা ছিল এক থ্যাকে দ্যাড় মিনিট। এই ধরনের কাজে সময় বেশি লাগলিই বিপদ অয়। কারুণ টার্গেটেরও লোকজন থাহে। খবর পালি তারাও যন্ত্র নিয়ে

চ্যলে আসে। কুসুর (আখ) ক্ষেতের মধ্যি দিয়ে চ্যলে গ্যালাম নিরাপদে।

পরে জানলাম টার্গেটের লোকজন যন্ত্র নিয়ে রওনা অইছিল। আর ইট্টু দেরি করলিই মারা পড়তাম। কারণ আমাগরে কাছে যে যন্ত্র ছিল তা দিয়ে ওদের ঠ্যাহাবের পারতাম না। এক্কেরে জানে মরতাম।'

এই কথাগুলো যিনি বললেন, তিনি একটি জেলা শহরের পরিচিত মানুষ। 'আপনাদের এই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ...।' আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না।

'এই জন্যেই আপনেদের মতো সাম্বাদিকগরে সাথে কথা ক্যবের চাইনে। বসের কতা ফেলবেরও পারি নে।'

রেগে গিয়ে পকেট থেকে গোল্ড লিফের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। আমার সামনে প্যাকেট রেখে টানতে থাকলেন। পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, স্যরি ঐ প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। বললাম, গুলি বের হয় না এমন যন্ত্র নিয়ে মানুষ মারতে গেলেন, আপনের তো অনেক সাহস। প্রশ্নটা বোকার মতো হলো, নিজেও বুঝতে পারলাম।

ঢাকার আন্ডারওয়ার্ল্ডের র‍্যাংকিংয়ে ব্ল্যাক প্যান্থার বাহিনীর কালা জাহাঙ্গীরের অবস্থান এখন এক নম্বরে। কচি, তনাই মোল্লা এবং শহীদ কমিশনার তার প্রধান শেল্টারদাতা

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন। বললেন, 'গুলি বের অয় না, এইডা জানলে কী আর যাতাম। আমার কাছে ছিল এ্যাটা মরচা পরা কাটা রাইফেল। অন্য তিনজনের কাছে ছিল পাইপগান। যন্ত্র হিসেবে কাটা রাইফেলের তুলনা নাই। আসলে ইট্টু বেশি পুরান অয়া গেছে তো। আর পাইপগানের তো কোনো মা-বাপ নাই। ম্যারবেন বাঁয়ে লাগবি নাকে। একদিক গুলি করলি আর একদিক যায়। একজনরে ম্যারবেন আর একজন মরবি।...'

বিড় বিড় করে কী যেন বললেন। কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেই বলে উঠলেন, 'আমরা তো শুধু গুলি করি। সেই গুলিতে মানুষ মরে। আমাগরে কন সন্ত্রাসী। যে গুলি করায় তারে তো সালাম দেন। তার তো... ও ফেলবের পারেন না।'

তার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ কথা হলো। তিনি আঞ্চলিক, শুদ্ধ এবং ঢাকাইয়া ভাষা মিলিয়ে কথা বলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকায় চলে এসেছেন। অবস্থা কোন দিকে যায় সেটা দেখছেন। আরো কয়েকদিন পর্যবেক্ষণ করে হয় এলাকায় ফিরে যাবেন, না হয় তিন মাসের জন্য ভারতে চলে যাবেন। পাসপোর্ট, ডলার রেডি করে বসে আছেন। যে হত্যাকান্ডটির কথা উল্লেখ করা হলো, এরকম হত্যাকান্ড তিনি ঘটিয়েছেন অনেকগুলো। তবে একটি ছাড়া আর বলতে রাজি হলেন না। বসের নির্দেশেই তিনি 'টার্গেট'কে গুলি করে খুন করেছেন। বস গত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন। যার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তিনিই 'টার্গেট'। এই টার্গেটের জন্য বসকে ব্যয় করতে হয়েছে, ৮০ হাজার টাকা। ৮০ হাজার টাকা বসকে আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে।

না, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নয় কোনো খন্ডিত বা অসম্পূর্ণ চিত্র। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটা এখন স্বাভাবিক চিত্র। এরই নাম এখন রাজনীতি। গ্রাম, মফস্বল বা রাজধানী শহরের মধ্যে এখন আর কোনো পার্থক্য নেই। রাজনীতির চিত্র সারা দেশে একই রকম। নির্বাচন বা দখল– যা কিছুই হোক না কেন প্রয়োজন অস্ত্র, প্রয়োজন অস্ত্রধারী। এই সন্ত্রাসীদের রয়েছে অবৈধ অস্ত্রের ভান্ডার। আপনি অর্থ দিলে তারা যে কাউকে খুন করে আপনার পথের কাঁটা পরিষ্কার করে দিতে পারে। মানুষ খুনের হিসাব এক এক জনের কাছে এক এক রকম। কেউ খুন করিয়ে উল্লাস করে, আবার কেউ খুন করা দেখে বা শুনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। একজন পেশাদার খুনির মতে, 'যখন গুলির আকাল, দাম বেশি থাকে তখন একজনকে মারার জন্য একটি বা দু'টির বেশি গুলি খরচ করি না। আর যখন গুলির দাম কম থাকে তখন একটার জায়গায় গুলি দশটা খরচ করি।'

লেনিন বলেছিলেন, 'রাজনীতিতে সততা হচ্ছে শক্তির ফলশ্রুতি, আর ভন্ডামি হচ্ছে দুর্বলতার ফলশ্রুতি।'

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এখন সততা নেই। নেই শক্তিশালী নেতা, সবল মানুষ। মানুষগুলো কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে, দুর্বলতা তার সারা অবয়ব জুড়ে। প্রকাশ্য দিবালোকে খুনি খুন করে বীরের মতো চলে যায়। মানুষ দৌড়ে পালায়, ভীরু চোখে তাকিয়ে দেখে। তারা কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, রুখে দাঁড়ায় না।

এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজে এখন দাপট রাজনৈতিক ভন্ডদের। তাদের রাজনৈতিক ভন্ডামিতে এখন চলছে রক্তের খেলা। এই রক্তের খেলায় খেলোয়াড় সন্ত্রাসীরা। আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর ভাষায়, 'সবারই এখন আলাদা বাহিনী আছে।'

কারো বাহিনী সবল, কারো বাহিনী দুর্বল। যার বাহিনী দুর্বল তার চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। আছে ভাড়াটে বাহিনী। এতদিন তাদের হাতে ছিল শুধুই অবৈধ অস্ত্র। এখন ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের অনেকের হাতেই রয়েছে বৈধ অস্ত্র। সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ নাকি জেলখানায় আটক সন্ত্রাসীদের তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে নিয়ে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন তাদের হাতে। সেই অস্ত্রের গুলিতেই নিহত হয়েছিলেন ডা. মিলন। এ ইতিহাস সবারই জানা। '৯৬-এর নির্বাচনে বিজয়ী গণতান্ত্রিক সরকার সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিয়েছে বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্স। সেই অস্ত্রের ব্যবহার এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি। তবে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা। নির্বাচনকে সামনে রেখে ঠিক করছেন বাজার দর। নিজের বাহিনীকে গড়ে তুলছেন নতুন করে। কিনছেন অস্ত্র, পরিবর্তন করছেন নাম, আস্তানা। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার জন্যে এক বাহিনীর সঙ্গে অন্য বাহিনীর বিরোধও

এখন তুঙ্গে। সুযোগ পেলেই এক সন্ত্রাসী হত্যা করছে আরেক সন্ত্রাসীকে।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নয়া মেরুকরণ হয়েছে রাজধানীর আন্ডারওয়ার্ল্ডে। অপরাধ জগতের পরিচিত নাম সেভেন স্টার গ্রুপ। টোকাই সাগর, সুব্রত বাইন শুভ্র, ভুঁইয়া রিপন, মোল্লা মাসুদ, টিক্কা, জয় এবং জন– এই সাত তারকার নামেই গড়ে ওঠে সেভেন স্টার বাহিনী। এই সাত তারকার একজন ২০০০কে জানায়, 'আমরা আমাদের গ্রুপের নাম কখনো সেভেন স্টার রাখিনি। আপনারা, সাংবাদিকরা আমাদের নাম দিয়েছেন সেভেন স্টার। যেহেতু আমরা সাত জন নেতা। তাই নামটাও আমাদের পছন্দ হয়। তারপর থেকে আমরা সেভেন স্টার নামে কাজ করতে থাকি।'

এই সেভেন স্টার গ্রুপের ভুঁইয়া রিপন বেশ কিছুদিন আগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আর সম্প্রতি পুলিশের গুলিতে প্রথমে আহত, গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তারকা জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে টিক্কার। এই গ্রুপের অন্যতম স্টার ত্রিমোতী সুব্রত বাইন শুভ্র এখন দেশে না বিদেশে– এ কথা সঠিকভাবে বলতে পারেন না কেউই। এমন কী গোয়েন্দা কর্মকর্তারাও না। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুভ্র তার ৩০ সহযোগী নিয়ে ভারতে চলে গেছে। দেশে-বিদেশে যেখানেই থাক না কেন, শুভ্রই সেভেন স্টার গ্রুপের মূল চালিকাশক্তি। এই তারকারা এখন আর সেভেন স্টার গ্রুপ নামে পরিচিত নয়। বাহিনীর এবারের নামটি তারা নিজেরাই দিয়েছে। তারা এখন পরিচিত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বাহিনী নামে। সম্প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে তারা এই নাম ধারণ করেছে বলে জানা যায়। দলে নেয়া হয়েছে অনেক তরুণ ক্যাডার।

বরিশালের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ত্রিমোতি সুব্রত বাইন শুভ্র। বাবা চাকরিজীবী। মগবাজার এলাকার এক ছন্নছাড়া যুবক শুভ্র। টিক্কা তখন মগবাজার এলাকার পরিচিত সন্ত্রাসী। একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে শুভ্রর সঙ্গে পরিচয় হয় টিক্কার। তখন থেকেই টিক্কার শেল্টার পায় শুভ্র। সেই সময় মগবাজার এলাকার প্রধান সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ক্যাডার রফিক। রফিককে খুন করার মধ্য দিয়ে টিক্কা-শুভ্র'র অবস্থান এলাকায় সুদৃঢ় হয়।

ইস্কাটন, কাঁঠালবাগান এলাকার যুবলীগ নেতাদের বাহিনীর সঙ্গে তাদের শত্রুতা অনেক আগে থেকে। মূল বিরোধ এলাকার দখল। যে কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছেই মগবাজার এলাকাটি খুবই আকর্ষণীয়। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ভাষায় সোনার খনি। মগবাজার এলাকায় আবাসিক হোটেলের সংখ্যা ২০টি। হোটেলগুলো খুব ভালো বা

রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাহিনীর অন্যতম সন্ত্রাসী ত্রিমোতি সুব্রত বাইন শুভ্র। আন্ডারওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে তার অবস্থান এখন দুই নম্বরে। বিএনপির কোনো কোনো নেতার সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলে জানা যায়

বড় না হলেও নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম চলে হোটেলগুলোতে। ফলে আয় ভালো। প্রতিটি হোটেল থেকে প্রতি মাসে চাঁদা পাওয়া যায় কমপক্ষে ১৫ হাজার টাকা।

১৫টি ম্যাসেস পারলার রয়েছে এই এলাকায়। এই পারলারগুলোর বিরুদ্ধেও রয়েছে অনেক অভিযোগ। এক একটি পারলার থেকেও চাঁদা বাবদ পাওয়া যায় প্রতি মাসে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা। এছাড়া 'পিয়াসী' বার থেকেও মাসে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা আসে। হোটেল, ম্যাসেস পারলার এবং বার থেকে মাসে চাঁদা বাবদ আয় হয় প্রায় ৮ থেকে ৯ লাখ টাকা। এলাকা যার দখলে থাকে সেই পায় এই অর্থ। এই অর্থকে বলা যেতে পারে এলাকার নিয়ন্ত্রণকারী সন্ত্রাসীর বেতনের বেসিক। অন্যান্য বেনিফিট তো আছেই। ফলে মগবাজার এলাকাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর মধ্যে বিরোধ সব সময়ই ছিল তুঙ্গে।

ইস্কাটনের যুবলীগ ক্যাডারের বাহিনী এই অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই দখলে নিতে চায়। এর জন্য সব রকম চেষ্টাই তারা করে। অবশেষে এই যুবলীগ নেতা তার চিরশত্রু সুইডেন আসলামের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, মগবাজার এলাকা দখল নেয়ার জন্যে। ১৯৯৮ সালে এই যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যায়। জেলখানার ভেতরে সুইডেন আসলামের সঙ্গে একাধিক মিটিং হয়। মিটে যায় তাদের পুরনো বিরোধ। শুধু বিরোধই মিটে যায় না, বিস্ময়কর রকমের ভালো সম্পর্কও গড়ে ওঠে দু' জনের মধ্যে।

মগবাজার এলাকার আরেক সন্ত্রাসী আরমান। ১৯৯৭ সালে আরমান পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। '৯৮ সালে জামিনে বেরিয়ে আসে। মামলা দুর্বলভাবে সাজানোই তার জামিন পাওয়ার অন্যতম কারণ। তবে এই জামিনের পেছনে যুবলীগ নেতার ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়। মগবাজার এলাকায় আরমানেরও রয়েছে শক্তিশালী বাহিনী। আরমান এবং শুভ্র-টিক্কা বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। আরমান ছিল সুইডেন আসলামের সেকেন্ড ইন কমান্ড। অনেক সময় সুইডেন আসলামের দেহরক্ষীর দায়িত্বও সে পালন করতো। জেল থেকে বের হয়ে এসেই সুইডেন আসলামের নির্দেশে আরমান যোগ দেয় যুবলীগ নেতার বাহিনীতে। বের হওয়ার পরপরই আরমান বাহিনী মগবাজারে আক্রমণ করে শুভ্র-টিক্কা বাহিনীর ওপর। রমনা থানা পুলিশ সব সময় শেল্টার দেয় আরমান বাহিনীকে। রমনা থানার ওসি রফিক (বর্তমানে লালবাগ থানায়) সব সময় আরমান বাহিনীকে শেল্টার দিত। ওসি রফিকের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস তার বাড়ি গোপালগঞ্জ। মগবাজার এলাকায় যে কোনো ঘটনা যারাই ঘটাক না কেন, কেস হতো শুভ্র, টিক্কাদের নামে। '৯৮ সালে মগবাজার রেলগেটের কাছে মুক্তিযোদ্ধা যুব কমান্ডের অফিস ভাঙচুর করে আরমান বাহিনী। ভেঙে ফেলা হয় বঙ্গবন্ধুর ছবি। কিন্তু রমনা থানায় মামলা হয় টিক্কাদের নামে।

১৯৯৮ সালেই যুবলীগ নেতার সমর্থনপুষ্ট আরমান বাহিনী দখল নিয়ে নেয়

মগবাজারের। মগবাজার এলাকা বর্তমানের রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাহিনীর দখলে থাকলেও, চাঁদা এককভাবে নিত টিক্কা। শুভ্র-টিক্কা ছিল খুবই ভালো বন্ধু। এ কারণে চাঁদার টাকা শুভ্র নিত না। এলাকা দখলে নিয়ে আরমান বাহিনী টিক্কাকে ধরা অথবা মারার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। আরমান জানতো টিক্কা বেঁচে থাকলে এলাকা সে বেশিদিন দখলে রাখতে পারবে না। পুলিশের পাশাপাশি আরমান বাহিনীও টিক্কার পেছনে সোর্স লাগায়। আরমান বাহিনীর সোর্সের খবরের ভিত্তিতেই '৯৮ সালে গাওছিয়া মার্কেট থেকে টিক্কাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও টিক্কাকে গ্রেপ্তারের রমরমা অপারেশনের বর্ণনা দিয়েছিল পুলিশ। পরবর্তীতে জানা যায়, যার কিছুই সত্যি নয়। টিক্কাকে ধরে প্রথমে ইস্কাটন এলাকার একটি ক্লাবে আনা হয়েছিল। যুবলীগ নেতা এবং আরমান বাহিনী চেয়েছিল হাত-পা কেটে তারপর গ্রেপ্তার দেখাতে। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপে হাত-পা কাটা থেকে রক্ষা পায় টিক্কা।

গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যায় প্রায় ৩০টি হত্যা মামলার আসামি টিক্কা। দু' বছরের মাথায় সবক'টি মামলা থেকে জামিন পেয়ে আবার বেরিয়েও আসে। এর কিছুদিন আগে জামিনে মুক্তি পায় শুভ্র। এরপর থেকেই শুভ্র-টিক্কাদের গ্রুপটি পরিচিতি পায় 'সেভেন স্টার' গ্রুপ নামে। অবশেষে আরমান বাহিনীর কারণেই মৃত্যু হলো টিক্কার। সেই কাহিনী পরে শোনাব।

তৌহিদুজ্জামান টিক্কা, পুলিশের গুলিতে আহত, পরে নিহত

টিক্কাদের পক্ষ থেকে সেদিন কোনো গুলি ছোঁড়া হয়নি। ডিবি খুব সহজেই টিক্কাসহ তার পাঁচ সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। ধরা পড়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের চাপে কাছে থেকে টিক্কাকে গুলি করে ডিবি

বর্তমান সময়ে ঢাকার আরেকটি আলোচিত সন্ত্রাসী গ্রুপের নাম 'ব্লাক প্যান্থার'। ব্লাক প্যান্থার গ্রুপটির মূল ব্যক্তি কালা জাহাঙ্গীর। এতদিন কালা জাহাঙ্গীর নিজের নামেই গ্রুপ চালাত। কালা জাহাঙ্গীর এখন অপরাধ জগতের ক্যাডারদের র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে।

সুব্রত বাইন শুভ্রদের সঙ্গে বিরোধের জের ধরে গোপাল কর-জাসদ বাবু-মামুনকে (সুইডেন আসলামের বউ ইতিকে বিয়ে করেছিল যে মামুন) নিয়ে একটি আলাদা গ্রুপ তৈরি করে। এই সময় অনেক জুনিয়র ক্যাডারকে তারা দলে নেয়। ছাত্রলীগের মন্টু গ্রুপের ক্যাডার মাসুম আহমেদের শেল্টারে এই গ্রুপটি আশ্রয় নেয় জহুরুল হক হলে। বিএনপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতিন চৌধুরীর শেল্টারে মাসুম আহমেদ নিয়ন্ত্রণ করতো জহুরুল হক হল। গোপাল কররা সেই সময় গ্রুপে যে জুনিয়র ক্যাডারদের সমাবেশ ঘটিয়েছিল তাদেরই একজন আজকের কালা জাহাঙ্গীর। কালা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে জহুরুল হক হলে হত্যা করা হয় কিসলুকে। ধারণা করা হয় এটাই কালা জাহাঙ্গীরের ঘটানো প্রথম হত্যাকান্ড। সম্প্রতি সে হত্যা করলো মিরপুর এলাকার ব্যবসায়ী শফিকুর রহমান নান্টুকে। কোর্ট এলাকায় মুরগি মিলনকেও হত্যা করা হয়েছিল কালা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে। তার বিরুদ্ধে মামলাই আছে ৩০টি। তবে তার হাতে খুনের সংখ্যা একশ' ছাড়িয়ে গেছে বলে জানা যায়।

মিরপুরের আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কচি কালা জাহাঙ্গীরের প্রধান শেল্টারদাতা বলে জানা যায়। এ কারণে ক্যান্টনমেন্ট-মিরপুর-কাফরুল অঞ্চলে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করে নিয়েছে কালা জাহাঙ্গীরের 'ব্লাক প্যান্থার' গ্রুপ। এছাড়া পুরনো ঢাকার আরেক প্রভাবশালী গডফাদার তনাই মোল্লা এবং শহীদ কমিশনারের শেল্টারও পায় কালা জাহাঙ্গীর। পুরনো ঢাকার বিএনপি নেতা হাবিব মন্ডলকেও খুন করে কালা জাহাঙ্গীর বাহিনী।

এক সময় ঢাকার সন্ত্রাসী জগতে যাদের ছিল দোর্দন্ড প্রতাপ, তাদের কেউ কেউ খুন হয়েছে। অনেকে আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তাদের কাউকে কাউকে এখন আবার চাঙ্গা হতে দেখা যাচ্ছে। তাদেরই একজন রাশু। যার এক সময় ব্যাপক পরিচিতি ছিল ফ্রিডম রাশু নামে। ফ্রিডম রাশু দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসী জগতে সক্রিয় ছিল না। এখন আবার সে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জানা যায়, আসন্ন নির্বাচনই তাকে সক্রিয় করে তুলেছে। নির্বাচন করবেন এমন একাধিক রাজনৈতিক নেতা তার রসদ যোগান দিচ্ছেন বলে জানা যায়। সেই রসদের যোগান নিয়েই ফ্রিডম রাশু এবং মোতাহার গঠন করেছে সন্ত্রাসী বাহিনী 'পাইথন'।

নগরীতে পিচ্চি হান্নানের নেতৃত্বে আর একটি গ্রুপ জন্ম নিয়েছে। এই গ্রুপটির নাম 'কোবরা'। মোঃপুর এলাকার একজন সাবেক সাংসদের শেল্টার এবং রসদেই সংগঠিত হয়ে উঠছে 'কোবরা' বাহিনী। জব্বর, মুন্না প্রমুখ চিহ্নিত সন্ত্রাসী ইতিমধ্যে 'কোবরা' গ্রুপে যোগ দিয়েছে বলে জানা যায়। মোঃপুর এলাকার অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সঙ্গেও তাদের দরকষাকষি চলছে বলে জানা যায়। অস্ত্র কেনার জন্য সাবেক সাংসদ তাদের ৩০ লাখ টাকা দিয়েছেন বলে জানা যায়। পিচ্চি হান্নানকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে সম্প্রতি একটি নাটক করেছে পুলিশ। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে পুলিশ। হান্নান নামক একজনকে ধরে প্রচার করছে সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নানকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই অনুযায়ী পত্রিকায় প্রেস রিলিজ পাঠিয়েছে। ধানমন্ডি থানা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে শহীদুল হক ওরফে হান্নান নামক এখন পলাতক আসামীকে। এই শহীদুল হককেই পুলিশ পিচ্চি হান্নান নামে চালাতে চাইছে।

রমনা থানা পুলিশও কমরেশ কুমার দাশ

ওরফে জয় নামক একজনকে গ্রেপ্তার করে বলছে সেভেন স্টার গ্রুপের সন্ত্রাসী জয়কে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ একদিকে সন্ত্রাসীদের ধরছে না, অন্যদিকে উল্টাপাল্টা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অনেক হয়েছে, এবার সময় এসেছে পুলিশের জবাবদিহিতার। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েও যদি অসৎ পুলিশ বিভাগের অনৈতিক কাজের শাস্তি না হয়, আর কবে হবে? আর যাই হোক এই ১০০% অসৎ পুলিশ বিভাগ দিয়ে অস্ত্র উদ্ধার হবে না, সন্ত্রাসীরাও ধরা পড়বে না।

পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড ৩৩ জন অপরাধীর মধ্যে রয়েছে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাহিনীর দলনেতা সুব্রত বাইন, মোল্লা মাসুদ, জয়, মোহাম্মদপুরে দু' সহোদর হত্যা মামলার আসামি কামাল পাশা, একাধিক হত্যা মামলার আসামি বিহারী মুন্না, দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীর, আরমান, মালিবাগের ৪ কুনের নায়ক দুলাল ও সালাম, একাধিক হত্যা মামলাসহ প্রায় ২৫টি মামলার আসামি পিচ্চি হান্নান, যুবলীগ ক্যাডার হেমায়েত, নাইন শুটার লিটন, লেদার লিটন, সন্ত্রাসী বিকাশের ভাই প্রকাশ, আল আমীন শিকদার, শ্যামপুর করিমুল্লাবাগের শাহাদত শিকদার, কালা জাহাঙ্গীরের আশ্রয়দাতা ওয়ার্ড কমিশনার শহীদ, মহাখালী রসুলবাগের ট্রিপল মার্ডার কেসের আসামি মোতাহার, তেজগাঁও-এর কিরণ, সোবহান, পুরানো ঢাকার আগা শামীম, মহাখালীর ইমাম, রবু, সিদ্ধেশ্বরীর ফ্রিডম রাশু, খিলাগাঁও এর বদরুল, সূত্রাপুরের ফিরোজ আলম পিন্টু, সায়েদাবাদের মুন্না, বুদ্দিন, আবু হায়দার বাবু ওরফে মিরপুরে বাবু, শাজাহানপুরের মানিক, মাইকেল টিটো আগারগাঁও বিএনপি বস্তির হাজী নূর মোহাম্মদের পুত্র সেন্টু প্রমুখ। উল্লেখিত পুলিশ এদের কাউকেই ধরতে পারছে না, অথবা ধরতে চাইছে না। কারণ এদের ধরলে পুলিশের আয় কমে যাবে।

ঢাকার বাইরেও থাকবে ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের তান্ডব। এলাকার স্থানীয় মাস্তানদের বাইরেও অন্য জেলার লোক এনে ব্যবহার করা হতে পারে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থিদের সঙ্গে বিগত সরকার তাদের চুক্তি মত কাজ করতে পারেনি। আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্তিকর জীবন থেকে ফিরিয়ে আনা হলেও শেষ পর্যন্ত চরমপন্থিদের অধিকাংশই নিরাশ হয়ে আবার ফিরে গেছে সেই জীবনে। কয়েকজন নেতা রয়ে গেছেন শুধু জেলে। সামনের নির্বাচনে চরমপন্থিদের বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন এলাকায় ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে নির্বাচনে আসলেই কী ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করা হবে? এখন

একজনের গুলি বাড়ায়া যায়া ল্যাগলো গার্ডের বুকে। চিৎকার দে পড়ে গেল সে। বন্দুকের দিকে হাত বাড়ালো টার্গেটে। ককটেল মারল একজন। আমার গুলিও বার ওলো। গিয়ে লাগলো এক্কেবারে টার্গেটের মাথায়। তারপর আর এ্যটা গুলি করলাম বুহি (বুকে)

পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী এর যৌক্তিক উত্তর হ্যাঁ। যুক্তি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টানা যায়। এখানে হল দখলে রাখতে ছাত্রলীগ তাদের নেতাদের নয়, ক্যাডারদের ব্যবহার করছে। তেমনি বুথ দখলে রাখতেও প্রার্থীরা গানম্যান ব্যবহার করবে। যার গানম্যান নেই সে সন্ত্রাসীদের ভাড়া করবে।

নির্বাচন মানেই ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের রমরমা ব্যবসা। সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ কথা যেমন প্রযোজ্য একই ভাবে প্রযোজ্য ইউপি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। ইউপি নির্বাচনের সময় বড় গ্রুপগুলোর কাজ করতে সুবিধা হয়। মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে তারা ঢাকার বাইরে গিয়ে অপারেশন করে ফিরে আসে। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সন্ত্রাসী বাহিনীগুলোর অবস্থান কী হবে– সেটা নিয়ে চলছে নানা রকমের আলোচনা। অপরাধ জগতের খোঁজ খবর যারা রাখেন, তাদের ধারণা বড় বড় সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো হয়ত নির্বাচনের সময় কোনো প্রার্থীর পক্ষে মাঠে নামবে না। কারণ এটা হবে তাদের জন্যে খুবই রিস্কি। ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে প্রবল। কারণ দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। এছাড়া বড় সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো মনে করে তাদের অবস্থান এখন অনেক ওপরে। নির্বাচনে ভাড়া খেটে যা আয় হবে সেটা তাদের কাছে খুবই নগণ্য। নির্বাচনের সময় ধরা না পড়লে পরবর্তী সময়ে তাদের আয় অনেক বেশি হবে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে ধরা পড়লে তাদের গডফাদাররা ছাড়ানোর জন্য তদবিরও করবে না। ফলে ব্লাক প্যান্থার, রয়েল বেঙ্গল টাইগার ইত্যাদি প্রফেশনাল সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো এখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। অবস্থা বুঝে তারা সিদ্ধান্ত নেবে।

এই পেশাদার সন্ত্রাসী বাহিনীগুলো যদি মাঠে নাও থাকে তাহলে কী নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাস কমবে? মোটেই না। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা দারুণভাবে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। এলাকার বড় প্রতিটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ-বিএনপি নেতাদের প্রত্যক্ষ শেল্টারে রয়েছে এসব রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা। তাদের কাছে থাকা অস্ত্রগুলো আধুনিক নয়। তবে তারা 'কোয়ালিটি নয়, কোয়ানটিটিতে বিশ্বাসী'। আর বাংলাদেশের অস্ত্রের বাজার এখন এমনই হয়েছে পাঁচ শ' থেকে সাত শ' টাকায় লেদ মেশিনে তৈরি পাইপগান পাওয়া যায়। ভারতীয় পয়েন্ট ৩২ পিস্তল পাওয়া যায় ১০ হাজার টাকায়। নাইন এমএম পিস্তল পাওয়া যায় ৩০ হাজার টাকায়। এই পিস্তলগুলো ভারতীয় হলেও লেখা থাকে মেড ইন ফ্রান্স বা বুলগেরিয়া। ভারতে তৈরি আরো অনেক ছোট অস্ত্র আছে যেগুলো পাওয়া যায় দু' থেকে তিন হাজার টাকার মধ্যে। মহল্লা কেন্দ্রিক ছিনতাইকারী এবং রাজনৈতিক সন্ত্রাসীদের

ইমন এখন কলকাতার জেলে, তার বাহিনী ঢাকায় তৎপর

পুলিশি ভেল্কি

সন্ত্রাসী জয়

গ্রেফতারকৃত জয়

সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান

গ্রেফতারকৃত পিচ্চি হান্নান

শহীদুল হককেই পুলিশ পিচ্চি হান্নান নামে চালাতে চাইছে। কমরেশ কুমার দাশ ওরফে জয় নামক একজনকে গ্রেপ্তার করে বলছে সেভেন স্টার গ্রুপের সন্ত্রাসী জয়কে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ একদিকে সন্ত্রাসীদের ধরছে না, অন্যদিকে উল্টাপাল্টা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে

কাছে রয়েছে এসব অস্ত্র।

তবে প্রফেশনাল সন্ত্রাসীরা মাঠে না থাকলেও তাদের কাছে থাকা আধুনিক অস্ত্রগুলো চলে আসতে পারে মাঠে। তারা নিজেরা মাঠে না থাকলেও ভাড়া দেবে অস্ত্র। অস্ত্র ভাড়া দেয়াও সন্ত্রাসীদের আয়ের একটা উৎস। কাটা রাইফেল, চাইনিজ রাইফেল বা একে-৫৬ ভাড়া পাওয়া যায় ৫ থেকে ৫০ হাজার টাকায়। পেশাদার সন্ত্রাসীরা এই অস্ত্রগুলো ভাড়া দেয় ঘন্টা বা দিন বা অপারেশন হিসেবে। কোনো সন্ত্রাসীর কাছ থেকে এই ভাড়া করা অস্ত্র খোয়া গেলে তার গডফাদার অস্ত্রের নির্দিষ্ট মূল্য দিতে বাধ্য থাকে। এটা অলিখিত নিয়ম। সবাই সে নিয়ম মেনে চলে। কেউ অমান্য করলেই ঘটে খুনের ঘটনা।

অবৈধ অস্ত্র চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে প্রবেশ করে। বৈধ পথে আসা অস্ত্রেরও একটা অংশ চলে যায় সন্ত্রাসীদের হাতে। শুটিং ক্লাব, টিসিবি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের এক্ষেত্রে ভূমিকা থাকে। এছাড়া বৈধ অস্ত্রের ব্যবসা যারা করে সেই ব্যবসায়ীরাও অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে বৈধ অস্ত্রের দোকানগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। শুটিং ক্লাব, টিসিবিও আছে চাপের মধ্যে। ফলে দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ডের গুলির বাজারে আকাল দেখা দিয়েছে। তবে অনেকে বলছেন এই আকাল কৃত্রিম। বড় গ্রুপগুলোর কাছে প্রচুর গুলি জমা আছে। সরকারি তৎপরতা বাড়াতে পারলে এই গুলি বাজারে আসার সম্ভাবনা কম। গুলি সহজলভ্য না হলে সন্ত্রাস এমনিতেই অনেক কমে যাবে। তবে এই কারণে বেড়ে যেতে পারে বোমার সংখ্যা। বোমা তৈরির জন্য যে পটাশ (সাদা), মুনসাল (লাল), গন্ধক (হলুদ) প্রয়োজন হয়, এগুলো দেশে খুবই সহজলভ্য। ম্যাচ ফ্যাক্টরির জন্যে এগুলো দেশে অবাধে আমদানি করা হয়। পুরান ঢাকার নবাবপুর, চকবাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে পটাশ, গন্ধক আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা খুবই জরুরি। ইতিমধ্যে যা আমদানি হয়েছে সেগুলোর ব্যবহারও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। খুচরা বিক্রি হয়ে কোনোভাবেই যেন এগুলো সন্ত্রাসীদের হাতে চলে না যায় সেদিকে সবচেয়ে বেশি শক্ত হতে হবে সরকারকে। কারণ পুলিশ অস্ত্র উদ্ধার না করলেও বিডিআর বা আর্মি মাঠে নামলে অস্ত্র বের করতে সাহস করবে না সন্ত্রাসীরা। কিন্তু বোমা হামলা ঠেকানো বিডিআর, আর্মির পক্ষেও কঠিন হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক। ঢাকা যার দখলে থাকে তারাই সরকার গঠন করে। গত দুটি নির্বাচনে সেটা প্রমাণ হয়েছে। এ বছর তাই বিএনপি-আওয়ামী লীগ উভয়েই চাইছে ঢাকা দখলে রাখতে। সব প্রার্থীই জনসংযোগের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের সঙ্গেও সংযোগ রক্ষা করে চলেছে।

গত নির্বাচনে বিএনপি'র একমাত্র বিজয়ী প্রার্থী সাদেক হোসেন খোকা। এলাকায় তার অবস্থান এমনিতেই ভালো। ব্রাদার্স ক্লাব কেন্দ্রিক দু' তিনটি বাহিনী তার পক্ষে কাজ করতে পারে। অস্ত্র, ক্যাডার সব দিক দিয়েই এই গ্রুপগুলো শক্তিশালী। এছাড়া নিহত সন্ত্রাসী আসিফের ছোটভাই মামুন ভাইয়ের গ্রুপের দায়িত্ব নিয়েছে। মামুন গ্রুপকেও কাজ করতে দেখা যেতে পারে খোকার পক্ষে। এই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মেয়র পুত্র খোকন। নগরভবন কেন্দ্রিক দু' তিনটি সন্ত্রাসী গ্রুপ কাজ করবে খোকনের পক্ষে। এরমধ্যে প্রধান আগা শামীম গ্রুপ। এই গ্রুপের সঙ্গে মেয়র এবং মেয়র পুত্রের সম্পর্ক খুবই ভালো।

ডা. ইকবালের পক্ষে কাজ করবে যুবলীগ নেতাত্রয়ের একটি বাহিনী এবং তাদের সমর্থিত আরমান বাহিনী। এই বাহিনীর হাতে প্রচুর আধুনিক অস্ত্র রয়েছে বলে জানা যায়। বিএনপি মিছিলে গুলি করে মানুষ মেরে বিখ্যাত হওয়া সেই দুলালরা এখন এলাকা ছাড়া। নির্বাচনের আগে তারাও এলাকায় ফিরে আসতে পারে ইকবালের পক্ষে কাজ করার জন্য। এই আসনের বিএনপি প্রার্থী মেজর মান্নান, গত পাঁচ বছর এলাকায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। রয়েল বেঙ্গল টাইগার গ্রুপের সঙ্গে যেহেতু বিএনপি'র সম্পর্ক ভালো, সে কারণে এই গ্রুপটির মেজর মান্নানের পক্ষে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই গ্রুপের কারো কারো সঙ্গে ইকবালের সম্পর্কও ভালো। এই গ্রুপের প্রধানরা মাঠে না থাকলেও জুনিয়র ক্যাডাররা থাকবে। টাকার অংকের ওপর নির্ভর করবে তারা কার পক্ষে কাজ করবে।

ধানমন্ডি মোঃপুর এলাকার সাবেক সাংসদ হাজী মকবুলের ছেলে মাসুদেরই রয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এছাড়া ফ্রিডম রাশুর 'কোবরা' গ্রুপও কাজ করতে পারে তার পক্ষে। ইমন কলকাতার জেলে থাকলেও তার বাহিনী মকবুলের পক্ষে কাজ করবে বলে জানা যায়। বর্তমানে এই এলাকার প্রভাবশালী সন্ত্রাসী জুলু'র বাহিনী কার পক্ষে কাজ করবে সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। মোঃপুর এলাকার ত্রাস হারিসও জেল থেকে বের হয়ে এসে তার বাহিনী সংগঠিত করছে।

হারিস কার পক্ষে কাজ করবে সেটা নিশ্চিত না হলেও, তার অবস্থান যে মকবুলের বিপক্ষে হবে সেটা নিশ্চিত। এই এলাকার বিএনপি প্রার্থী খন্দকার মাহবুবউদ্দিন বা যেই হোক হারিসের সম্ভাবনা আছে তার পক্ষে কাজ করার। সেক্ষেত্রে জুলুকেও যদি খন্দকার মাহবুবউদ্দিন দলে ভেড়াতে পারে সেটা হবে মকবুলের জন্য আতঙ্কের।

মানিক-মুরাদরা দীর্ঘদিন ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে শাহজাহানপুর এলাকা। মানিক বর্তমানে আমেরিকায়। মুরাদ এলাকাতেই আছে। সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে মুরাদের সম্পর্ক ভালো। এছাড়া এই নির্বাচনী এলাকায় ছাত্রলীগ যুবলীগের অনেক সন্ত্রাসী রয়েছে। তারা নামে পরিচিত না হলেও নির্বাচনের সময় কাজ দিয়ে আলোচনায় চলে আসতে পারে। বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাসের ছোট ভাই মির্জা খোকনের রয়েছে একটি বাহিনী। এই বাহিনীর কার্যক্রমের কারণেই মির্জা আব্বাসের ইমেজ নষ্ট হয়েছে। এই বাহিনী এবার কীভাবে কাজ করে তার ওপর মির্জা আব্বাসের ভাগ্য অনেকখানি নির্ভর করছে।

ডেমরা এলাকার সম্ভাব্য বিএনপি প্রার্থী সালাউদ্দিন। সব সময়ই তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ ছিল। গত নির্বাচনে তার পরাজয়ের পেছনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রধান ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়। এবারও ডেমরা সায়েদাবাদ এলাকার ছোট বড় অনেক সন্ত্রাসী তার পক্ষে কাজ করছে। এই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী হাবিবুর রহমান মোল্লা। সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী বাহিনী তার পক্ষে কাজ করবে বলে জানা গেছে।

কেরানীগঞ্জের বিএনপি প্রার্থী আমানউল্লাহ আমান। বিএনপি আমলে এলাকায় অনেক উন্নয়ন কাজ করেছেন। একটি শক্তিশালী বাহিনীও গড়ে তুলেছেন। এছাড়া সাবেক এবং বর্তমান ছাত্রদলের কিছু ক্যাডারও তার পক্ষে কাজ করতে পারে। তবে থানায় হামলা করে মামলায় জড়িয়ে তিনি অনেক ক্যাডার কর্মী আপাতত হারাবেন।

মিরপুরের আওয়ামী লীগ প্রার্থী কামাল মজুমদার। তার ছেলে জুয়েলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং ব্যবসায়ী শিপুকে হত্যা করায় কামাল মজুমদারের ইমেজ নষ্ট হয়েছে অনেকখানি। এছাড়া শিবপুর এলাকার প্রধান সন্ত্রাসী গ্রুপ 'ব্লাক প্যান্থার' নিয়ন্ত্রণ করে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কচি। কচির সঙ্গে কামাল মজুমদারের রয়েছে চরম বিরোধ। শেষ পর্যন্ত কচি যদি কামাল মজুমদারের পক্ষে কাজ না করে তাহলে তার জেতা কষ্টকর হবে। বিএনপি প্রার্থী যেই হোক তার নীরব ভোট আছে এবং গাবতলী, মিরপুর

বোমা তৈরির জন্য যে পটাশ (সাদা), মুনসাল (লাল), গন্ধক (হলুদ) প্রয়োজন হয়, এগুলো দেশে খুবই সহজলভ্য। ম্যাচ ফ্যাক্টরির জন্যে এগুলো দেশে অবাধে আমদানি করা হয়। পুরান ঢাকার নবাবপুর, চকবাজারে কিনতেও পাওয়া যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে পটাশ, গন্ধক আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা খুবই জরুরি

কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী বাহিনীও আছে।

ক্যান্টনমেন্ট এলাকার আওয়ামী লীগ প্রার্থী রহমতউল্লাহ। গত পাঁচ বছর তার তেমন কোনো সাড়া শব্দ শোনা যায়নি। একইভাবে এলাকায় ছিল না বিএনপি প্রার্থী মেজর কামরুলও। সেই অর্থে দু'জনের কারোরই সন্ত্রাসী বাহিনী নেই। তবে এখন দু'জনেই চেষ্টা করছেন এলাকার সন্ত্রাসীদের দলে নিতে।

নিজস্ব স্টাইলেই লালবাগ এলাকা শাসন করছে হাজী সেলিম। তার বাহিনী প্রধান সে নিজেই। এলাকায় ছোট ছিনতাইকারী মাস্তান নেই বললেই চলে। সবারই ছোট খাটো ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে হাজী সেলিম। কাউকে স্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা কিনে দিয়েছে। একটি ছিনতাইকারী গ্রুপকে মৌলভীবাজারে মদ ব্যবসার সুযোগ করে দিয়েছে। ছোট মাস্তান ও ছিনতাইকারীরা নির্বাচনে হাজী সেলিমের পক্ষে কাজ করবে। তবে তার প্রধান সন্ত্রাসীদের মধ্যে রয়েছে লম্বা সেলিমের নেতৃত্বে একটি সুদক্ষ বাহিনী।

সন্ত্রাসী জুবায়ের

কোনো ক্যাডার হাজী সেলিমের কথা না শুনলেই তার ওপর নেমে আসে বিপদ। শুধু হাজী সেলিম নয়, সব গডফাদারই চায় একান্ত বাধ্যগত ক্যাডার। কথা না শুনলেই জুনিয়রকে দিয়ে সিনিয়রের শাস্তির ব্যবস্থা করে। একদা সে ছিল তার প্রধান ক্যাডার, তার মৃত্য হয়ে যায় অনিবার্য। এটাই পেশাদার সন্ত্রাসীদের জীবনের নির্মম পরিণতি।

এরকম একজন সন্ত্রাসীর নাম রাশেদ, এতিম রাশেদ নামে যার অধিক পরিচিতি। আজিমপুর এতিমখানা সব সময়ই সন্ত্রাসীদের একটা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সন্ত্রাসী জগতের প্রথম দিকে রাশেদের কর্মকান্ডও এতিমখানা কেন্দ্রিক ছিল। এই কারণে এতিম না হয়েও তার নামের আগে যোগ হয়ে যায় এতিম রাশেদ। রাশেদ দেখতে ছিল সুন্দর। আচার ব্যবহার ছিল মার্জিত। প্রথম পরিচয়ে বিশ্বাস করার উপায় ছিল না যে এই রাশেদ একজন ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। লালবাগ আজিমপুর এলাকার সন্ত্রাসী এতিম রাশেদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ক্যাডার শামীম আহমেদ ওরফে পিচ্চি শামীমের। এসএম হলে ওঠে পিচ্চি শামীমের শেল্টার পায় রাশেদ। শামীমের মাধ্যমে লিয়াকত-আওরঙ্গদের কাছের লোক হয়ে যায় রাশেদ। এক পর্যায়ে শামীমের সঙ্গে লিয়াকত-আওরঙ্গদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। তমি-রতনের মাধ্যমে শামীমকে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয় লিয়াকত-আওরঙ্গরা। রাশেদ এই সময় তমি-রতনের পক্ষে কাজ করে। হাজী সেলিমের সঙ্গেও তার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। '৯৯ সালে লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সম্মেলনের সময় রাশেদ সভাপতি হতে চায়। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে তাকে সাংগঠনিক সম্পাদক বানিয়ে সমস্যার একটা সমাধান করা হয়। রাশেদ মনে করে তার সভাপতি

‘আমরা তো শুধু গুলি করি। সেই গুলিতে মানুষ মরে। আমাগরে কন সন্ত্রাসী। যে গুলি করায় তারে তো সালাম দেন। তার তো... ও ফেলবের পারেন না’

সন্ত্রাসী শফিউর

হতে না পারার কারণ আওয়ামী লীগ নেতা মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন। জালালের বাড়িতে সে গুলিও করে। সড়ক ভবন, এলজিইডি, ইআরডি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারী করে এবং ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে বিশাল অর্থের মালিক হয়ে যায় রাশেদ। লিয়াকত-আওরঙ্গদের এক নম্বর ক্যাডার হয়ে যায় রাশেদ। গত কোরবানির ঈদে লালবাগের গরুর হাটকে কেন্দ্র করে লালবাগের আরেক সন্ত্রাসী আশিষের সঙ্গে চরম বিরোধ দেখা দেয় রাশেদের। গরুর হাটের ডাক নিয়ে নেয় রাশেদ। আশিষদের ভালো সম্পর্ক আগামাসী লেনের সন্ত্রাসী আগা শামীমদের। আগা শামীমদের সঙ্গে আবার তীব্র বিরোধ লিয়াকত-আওরঙ্গদের। রাশেদের কারণে আশিষ, আগা শামীমদের লালবাগ-আজিমপুর এলাকায় ঢোকা কঠিন হয়ে যায়। রাশেদের এই উত্থান পছন্দ হয় না হাজী সেলিমেরও। আজিমপুর পলাশী এলাকার অল্প বয়সী তরুণদের নিয়ে একটি ক্যাডার বাহিনী গঠন করে এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এতিম রাশেদ।

একদিন বুয়েটের ক্যান্টিনে খেতে আসে রাশেদ। সে বুয়েটে এসেছিল একটি প্রাইভেট কারে। সে প্রাইভেট কারটি কয়েকদিন আগে এক যুবলীগ তাকে উপহার দিয়েছিল। তার সঙ্গে আরো চার পাঁচ জন ক্যাডার ছিল। এ সময় একটি পাজেরো ভি সিক্স গাড়ি নিয়ে কয়েকজন যুবক আসে বুয়েট ক্যাম্পাসে। তারা এসে ঢুকে যায় ক্যান্টিনে। রাশেদ তখন তার সহযোগীদের নিয়ে ভাত খাচ্ছিল। ভি সিক্স গাড়িতে আসা যুবকদের ক্যান্টিনে ঢুকতে দেখেই রাশেদ কিছু একটা বুঝতে পারে। কিন্তু কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘেরাও হয়ে যায় রাশেদ। তার বুকে নাইন এমএম পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়। নিহত হয় রাশেদ। ভি সিক্স পাজেরো নিয়ে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। জানা যায়, এর মধ্যে আগা শামীমের সন্ত্রাসী বাবুল, নাদিম প্রমুখ ক্যাডাররা ছিল।

রাশেদ যাদের নিয়ে ভাত খাচ্ছিল তার মধ্যে মহিউদ্দিন নামে এক ক্যাডার ছিল। মহিউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের ছেলে। মহিউদ্দিন ছিল মূলত রাশেদের দেহরক্ষী। হত্যাকারীদের সঙ্গে আগে থেকেই মহিউদ্দিনদের একটা যোগাযোগ হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। সে কারণে মহিউদ্দিন গ্রেপ্তারও হয়েছিল। পরে জামিনে মুক্তি পেয়েছে।

এই হলো এতিম রাশেদ তথা একজন ভাড়াটে সন্ত্রাসীর জীবন কাহিনী।

এবার আরেক জন সন্ত্রাসীর মৃত্যু কাহিনী। এই সন্ত্রাসীর নাম টিক্কা। যার পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে। টিক্কার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ছিল আকর্ষণীয়। তাকে যারা চিনত তাদের মতে টিক্কা ছিল ভদ্র। এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতো না। কিন্তু ভদ্র চেহারার আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক দানব। যে দানব একের পর এক হত্যা করেছে মানুষ।

টিক্কার সঙ্গে এক যুবলীগ নেতার বিরোধ স্থায়ী রূপ নেয়। রমনা থানা পুলিশ যুবলীগ নেতাদের পক্ষে থাকলেও ডিবি বা অন্য পুলিশের সঙ্গে টিক্কার সম্পর্ক খারাপ ছিল না। দেয়া-নেয়ার সম্পর্ক যেমন হয় তেমনি ছিল।

সন্ত্রাসীর অস্ত্রের লাইসেন্স ...

গত সরকারের সময় এমন সব লোক আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পেয়েছে যারা বৈধ অস্ত্র পাওয়ার যোগ্য নয়। এসব অস্ত্র সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দু’মাসে কেবল মাত্র ঢাকা শহরেই ৪৭০টি অস্ত্রের লাইসেন্স দিয়েছে। একটি সূত্রানুযায়ী, সারা দেশে এই সংখ্যা ২০ হাজারের বেশি হবে। অস্ত্রপ্রাপ্তদের মধ্যে সাজাপ্রাপ্ত মামলার আসামি, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের সংখ্যাই বেশি। সরকারের শেষ সময়ে লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে আর্মস অ্যাক্টের বিধিবিধান উপেক্ষা ও অত্যাবশ্যকীয় অনেক শর্তের বরখেলাপ করারও অভিযোগ রয়েছে। আওয়ামী সরকারের শেষ তিন মাসে অস্ত্রের লাইসেন্সের জন্য মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ সংবলিত শত শত দরখাস্ত টিসিবিতে জমা পড়ে। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, তড়িঘড়ি করে অল্প সময়ে এত লাইসেন্স দেয়ার ঘটনা গত ৩০ বছরে আর ঘটেনি। লাইসেন্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ব্যক্তিরা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অস্ত্রও ক্রয় করেছে।

শুধু লাইসেন্স নয়, অস্ত্র ক্রয়ের জন্য টিসিবিতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। জুন মাসে টিসিবি ১৭শ’ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি আমদানি করে। মূলত এই অস্ত্র পাওয়ার জন্য দাগি আসামি, রাজনৈতিক দলের ক্যাডারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে যায়। জানা যায়, এই ১৭শ’ অস্ত্রের বিপরীতে প্রায় ৩ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। টিসিবি সূত্রে জানা গেছে, ভিআইপিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অস্ত্র দেয়া হয়েছে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ছাড়া শীর্ষস্থানীয় সব নেতা অস্ত্রের লাইসেন্স করেছে। এমন কী ছাত্রলীগ ক্যাডার পিচ্চি শামীম, হেমায়েতরাও লাইসেন্সধারী অস্ত্রের মালিক এখন। কেউ কেউ আবার দু’টি লাইসেন্স করেছে। একটি পিস্তল অন্যটি নাইন শুটার শটগান। গত বছর টিসিবি ১২শ’ অস্ত্র ও ৫ লাখ গুলি আমদানি করে। ’৯৭-’৯৮ সালে আমদানি করা হয়েছিল মাত্র ৩৪৪টি আগ্নেয়াস্ত্র। আর এ বছর ১৭শ’ অস্ত্র আমদানি করার পরও টিসিবিকে হিমশিম খেতে হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিশ্চিত করেছে, নির্বাচনের কারণেই এ বছর অস্ত্রের এত চাহিদা ছিল। যাচাই-বাছাই না করে অবাধ লাইসেন্স দেয়ার ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। যেহেতু ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় ঐ দলের নেতা-কর্মীরাই লাইসেন্স পেয়েছে বেশি, সেহেতু এই অস্ত্র বিরোধীদের ওপর ব্যবহার হবে এটাই ধরে নেয়া যায়।

টিক্কাকে বলা হতো সৌখিন সন্ত্রাসী। কারণ অর্থের তার প্রয়োজন ছিল না। পারিবারিক ভাবেই তারা ছিল সচ্ছল। ৫৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার আওয়ামী লীগ নেতা মোখলেসুর রহমান টিক্কার আপন মামা। বড় মগবাজারের ২২৬ নং বাড়িটি তাদের। টিক্কার বাবার নাম আমির খান। 'মগবাজার ইন্টারন্যাশনাল' হোটেলের মালিক তারা। তবে আর্থিক অবস্থা ভালো হলেও সন্ত্রাস তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যই বলা যায়। টিক্কার আরেক ভাই শহীদও নগরীর পরিচিত সন্ত্রাসী।

এই টিক্কার কারণেই যুবলীগ নেতাদের মগবাজার এলাকায় যাতায়াত কঠিন হয়ে যায়। পুলিশকে চাপ দেয়া হয় টিক্কাকে গ্রেপ্তারের জন্য। কিন্তু পুলিশের পক্ষে টিক্কার নাগাল পাওয়া ছিল কঠিন। যুবলীগ নেতা তার নিজস্ব বাহিনীর মাধ্যমে সোর্স নিয়োগ করে টিক্কার পেছনে। সোর্সের মাধ্যমে যুবলীগ নেতা জেনে যায় টিক্কার গতিবিধি। টিক্কা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে বেশি সময় বা দিন থাকতো না। নোয়াখালী, মুন্সিগঞ্জ, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি জেলায় সে মাঝে মধ্যেই যেত। তবে তার মূল ঘাঁটি ছিল গাজিপুর এবং মুন্সিগঞ্জে। ঢাকার ভেতরে সূত্রাপুর, পল্লবী, মিরপুর প্রভৃতি এলাকায় যাতায়াত ছিল টিক্কার। আড্ডা দিতে এবং বাহিনী সংগঠিত করতে টিক্কা এসব এলাকায় যাতায়াত করতো। তবে টিক্কার এলাকা মগবাজারে সে '৯৮ সালের পর থেকে নিয়মিত থাকতো না। এক সময় মগবাজার মোড়ের 'সৌদি বাংলা ফিস ফিড' ছিল টিক্কার মূল ঘাঁটি। সন্ধ্যার পর সে এই অফিসে নিয়মিত বসত। এই অফিসের একটি ফোন টিক্কা ব্যবহার করতো। এই নম্বরে বাইরে থেকেও টিক্কার ফোন আসতো। ঢাকার সন্ত্রাসীদের প্রধান আড্ডার স্থান হয়ে উঠেছিল এই অফিস। জোসেফ, ইমন, মাইকেল, টিটো প্রমুখ নামকরা সন্ত্রাসীরা আড্ডা দিতে আসতো এখানে।

সন্ত্রাসী টিক্কা ছিল সাহসী এবং বেপরোয়া। সম্প্রতি মগবাজার রেলগেটের কাছে যুবলীগ নেতার গাড়িতে গুলি করা হয়। টিক্কা-শুভ্র'র নেতৃত্বাধীন রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাহিনী তাকে হত্যার জন্য গুলি করে বলে যুবলীগ নেতা জানায়। পত্রপত্রিকায়ও সেভাবেই রিপোর্ট হয়। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, যুবলীগ নেতাদের ওপর গুলি টিক্কা বাহিনী করেনি। টিক্কাদের নামে আর একটি কেসের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রেপ্তারের চাপ সৃষ্টির জন্যই এমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মূলত এরপর পুলিশ বেশি তৎপর হয়ে ওঠে। পুলিশকে তথ্য যোগান দেয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ। পরিকল্পিতভাবে পল্লবী এলাকার একটি বাড়িতে তাকে দাওয়াত দেয়া হয়। পল্লবী কালাপানি এলাকার ১ নং সড়কের ৭ নং বাড়িতে তারা দাওয়াত খেতে যায়। এ খবর পৌঁছে যায় যুবলীগ নেতার কাছে। যুবলীগ নেতা জানায় ডিবিকে। ডিবি গ্রেপ্তারের প্রস্তুতি নিয়ে পল্লবীতে গিয়ে হাজির হয়। রাত তিনটার দিকে ডিবি এই বাড়ির সামনে আসে। ডিবি প্রচার করে পনেরো মিনিট গুলি বিনিময়ের পর টিক্কাসহ তার পাঁচ সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু সরেজমিন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সে রাতে ডিবি'র দাবি অনুযায়ী বৃষ্টির মতো গুলির আওয়াজ তারা শোনেনি। দু'তিন রাউন্ড গুলির আওয়াজ শুনেছে তারা। অনুসন্ধানে জানা যায়, টিক্কাদের পক্ষ থেকে সেদিন কোনো গুলি ছোঁড়া হয়নি। ডিবি খুব সহজেই টিক্কাসহ তার পাঁচ সহযোগীকে গ্রেপ্তার করে। ধরা পড়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের চাপে কাছে থেকে টিক্কাকে গুলি করে ডিবি। আহত হয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে টিক্কার। ত্বরিত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী, যে একই সঙ্গে দুই হাতে দুটি নাইন এমএম পিস্তল চালাতে পারে বলে জানা যায়, সেই টিক্কা ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়তে থাকে। টিক্কার গ্রেপ্তারের খবর শুনে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ গভীর রাতেই আনন্দে মেতে ওঠে।

টিক্কা যখন ক্রমেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তার বাহিনীর কেউ খবর নিতে যায়নি। টিক্কা ধরা পড়ার পেছনে তার দলেরও কারো কারো ভূমিকা আছে বলে জানা যায়। টিক্কাকে গ্রেপ্তার করার সময় পুলিশ একটি প্রাইভেট কার ও একটি মোটর সাইকেল পায়। প্রাইভেট কারটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার গ্রুপের সন্ত্রাসী জয়ের। এই জয় কিছুদিন নিজেকে শেখ হাসিনার পুত্র বলে পরিচয় দিত। জানা যায়, টিক্কার খুব কাছের কেউই টিক্কাকে ধরিয়ে দিয়েছে।

মুমূর্ষু টিক্কার চিকিৎসার পরিবর্তে পুলিশ নির্যাতন চালায় গ্রুপের অন্যদের বিষয়ে তথ্যের জন্য। টিক্কা যাতে জীবিত না থাকে সেজন্যে সব সময় সক্রিয় ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ। এক পর্যায়ে টিক্কার নিজের গ্রুপও চায়নি টিক্কা বেঁচে থাকুক।

এটাই একজন টিক্কার পরিণতি। একজন সন্ত্রাসীর পরিণতি, সব সন্ত্রাসীর পরিণতি।

পরের দিন সকাল দশটার দিকে টিক্কাকে ডিবি হাসপাতালে নিয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে টিক্কার মৃত্যু অবধারিত হয়ে গেছে।

টিক্কার ভাই বাদী হয়ে ২৩ জুলাই রমনা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে। মামলায় সন্ত্রাসী টিক্কার পরিচিতিতে বলা হয়েছে, 'সম্ভ্রান্ত বংশীয় একজন ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক হিসেবে এলাকায় সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।'

মামলায় আসামি করা হয়েছে যুবলীগ নেতা লিয়াকত হোসেন, ডিবি ইন্সপেক্টর রেজাউল করিমসহ তেরো জনকে।

সন্ত্রাসী হলেও টিক্কাও একজন মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই মামলারও বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবতা কী? পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার তদন্ত পুলিশ করবে। তদন্ত কী করা হবে আর চার্জশিট কী দেয়া হবে। সেটা নিয়ে মন্তব্য না করাই ভালো।

স্বার্থ কী নির্মম!

প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ টিক্কার মৃত্যু চেয়েছে স্বাভাবিক কারণেই। স্বার্থের জন্য তার মৃত্যু চেয়েছে নিজের গ্রুপও। সন্ত্রাসীদের নির্দেশই কার্যকর করা হয়েছে পুলিশের মাধ্যমে।

এরাই বাংলাদেশের পুলিশ, গোয়েন্দা! এরা টিক্কাদের থেকে সুবিধা নেয়, নেয় তাদের আয়ের অংশ।

রাজনৈতিক নেতা নামধারী গডফাদাররা টিক্কাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, অর্থ দেয়। নেতাদের স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হয় টিক্কা-রাশেদরা। সন্ত্রাসী হিসেবে নাম করতে পারলে কয়েক দিনেই হয়ে পড়ে কোটিপতি। পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতা আয়ত্তে আনতে পারে সে। কিন্তু এই জীবন কত দিনের? পরিণতি কেমন? তা ভেবে দেখে না কোনো ভাড়াটে সন্ত্রাসী। তাই হাসপাতালের বেডে বিনা চিকিৎসায় তাদেরকে মরতে হয়, যেভাবে মারা গেল টিক্কা। গডফাদাররা খোঁজও নেয় না। আর দেশবাসী? তারা পত্রিকায় খবর পড়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কামনা করে কালকে যেন এরকম আরেক সন্ত্রাসীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়। একজনের গুলিতে মরছে আরেক জন।

এটা কি কোনো সুস্থ দেশের চিত্র?

'কার দিকে গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!'
তুমি কে, তুমি কি গ্রহান্তরের দলছুট?
তোমার কখনো ছিল না কি শৈশব?
তুমি কি কখনো দেখনি মাটিতে ঘুমন্ত কোনো শিশু?
জানলার ধারে দাঁড়ানো, একলা, শূন্য দৃষ্টি নারী?
কার দিকে গুলি ছুঁড়ছো হে, এখানে সবাই মানুষ!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিচিতি

প্রচ্ছদের রাইফেলটির নাম উইনচেস্টার। .২২ বোর। ম্যাগজিনে ১৭টি গুলি ভরা যায় একবারে। পাল্লা দেড় মাইল। উইনচেস্টার রিপিটার রাইফেলটি আকারে ছোট, দেখতে অনেকটা এয়ারগানের মত। এক হাতে ধরেই গুলি চালানো যায়। মানুষ মারার জন্য উত্তম অস্ত্র। লাইসেন্সধারী সন্ত্রাসীর কাছেও আছে এমন অস্ত্র। অবৈধভাবেও আছে অনেকের কাছে এমন অস্ত্র। তবে প্রচ্ছদের রাইফেলধারী কোনো সন্ত্রাসী নন। ২০০০-এর একজন কর্মী।